সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৬ ॥ সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২৬ ॥ অক্টোবর ২০১৮

https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.9

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা'-নাটক ও নাট্যের প্রতিরূপায়ণে নিম্নবর্গের উপস্থাপন

তানভীর নাহিদ খান*

সারসংক্ষেপ :

মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপক-সাংকেতিক নাটক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে লেখা এই নাটকে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধে মুখ্যত নিম্নবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে *মুক্তধারা* নাটক এবং নাট্যিক বিনির্মাণের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নবর্গের স্বকীয়তা অনুসন্ধান এবং বিনির্মাণে সেই স্বকীয়তার অন্তঃসার সন্ধান করা হবে। প্রতিরূপায়ণের ব্যাখ্যায় 'থিয়েটার'-নাট্যদলের পরিবেশনা আলোচনা করা হবে।

১.১

নিম্ন শব্দ দ্বারা নিচু, অনুন্নত, তলদেশ, হীন, ইত্যাদি বোঝায়। অন্যদিকে বর্গ শব্দ দ্বারা শ্রেণী, ধাপ, গোত্র ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নিম্নবর্গ বলতে সাধারণভাবে নিচু বা অনুন্নত কোন শ্রেণীকে বোঝায়। তাত্ত্বিকভাবে 'নিম্নবর্গ'-শব্দটি ইংরেজি 'Subaltern'-এর পরিভাষা হিসেবে প্রচলিত। সাবলটার্ন-শব্দের সাধারণ অর্থ : ব্রাত্য, হীন, অধস্তন, নিম্নস্থিত। ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ সাবর্ডিনেট। সাবলটার্ন এর বাংলা হিসেবে সর্বপ্রথম নিম্নবর্গ পরিভাষা করেন রণজিৎ গুহ। পরবর্তী সময়ে এটিই সার্বজনিকভাবে স্বীকৃত হয়। ইতালীয় দার্শনিক আন্তনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) সাবলটার্ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর কারাগারে বসে লেখা *'PRISON NOTEBOOKS'* -এ তিনি সাবলটার্ন-এর উল্লেখ করেন।

সাধারণভাবে ক্ষমতা সম্পর্ক দ্বারা নিম্নবর্গ বিচার করা যেতে পারে। ক্ষমতার একদিকে উচ্চবর্গ ও অপরদিকে নিম্নবর্গের অবস্থান। উচ্চবর্গের প্রভুত্ব এবং এর বাইরে সাধারণ মানুষের সেই প্রভু শ্রেণীর প্রতি অধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নবর্গ নির্ণয় করা সম্ভব। তবে এটাও ঠিক বয়স, পেশা, লিঙ্গ, শ্রেণী ইত্যাদি নানাভাবেই যে কেউ নিম্নবর্গে

*প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থিত হতে পারে। নিম্নবর্গকে কেবল একটি শ্রেণী দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে না। কেননা একই সমাজে অবস্থানকারী নিম্নবর্গ সেই সমাজেই তার চেয়ে নিচের স্তরের কারো চেয়ে উচ্চবর্গ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে : কোন গ্রামের জমিদারের তুলনায় জমির অধিকারী অবস্থাসম্পন্ন কৃষক নিম্নবর্গ। আবার এই অবস্থাসম্পন্ন কৃষক ভূমিহীন একজন মজুরের চেয়ে উচ্চবর্গ।

পুঁজিবাদী সমাজের বাইরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভু শ্রেণী ও অধস্তন শ্রেণীর কথা বলতে গিয়ে গ্রামশি, "জোর দিয়েছেন কৃষক শ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন" (পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮ : ৪)। গ্রামশি এখানে নিম্নবর্গের চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। প্রভু শ্রেণী ও নিম্নবর্গ শ্রেণী পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। তাই তাদের চেতনার মেরুকরণও বিপরীতমুখী হওয়া উচিত, কিন্তু নিম্নবর্গের চেতনা অনেকাংশেই প্রভুশ্রেণীর মতাদর্শের খোলসে আচ্ছন্ন থাকে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বলেন

> প্রভাবশালী সর্বভারতীয় গোষ্ঠীর চেয়ে সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের হলেও আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাবশালী দেশীয় মহল... সত্যিকার অর্থে তাদের নিজেদের সামাজিক স্বার্থে নয় বরং উচ্চবর্গের স্বার্থেই কাজ করেছে। (গায়ত্রী, ২০১১ : ৮৮)

উচ্চবর্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিম্নবর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে। শোষণ, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন এমনকি সম্মতির মাধ্যমেও এই নিয়ন্ত্রণের ফলে একসময় নিম্নবর্গ তার স্বাভাবিক প্রকাশ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গ্রামশি সাবলটার্ন শ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার কথা বললেও সেই সাথে পৃথক অভিব্যক্তির ইঙ্গিতও দিয়েছেন। যদিও ইঙ্গিতের প্রকৃত তাৎপর্য সরাসরি তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তবে এই ইঙ্গিতের আলোকেই 'নিম্নবর্গ'-ধারণাটির উদ্ভব। এরিক স্টোকস, রণজিৎ গুহ প্রমুখের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুনভাবে দেখা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার তাগিদে ১৯৮২ সালে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ গ্রুপ' কাজ শুরু করে। নব্বইয়ের দশকে রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় নিম্নবর্গ অধ্যয়নের ছয় খণ্ড সিরিজ বের হয়।

কেবল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা নয়, বরং প্রচলিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার বাইরেও ক্ষমতার অচলিত রূপ আছে এবং প্রতিনিয়ত ক্ষমতার নানা মেরুকরণ দেখা দিচ্ছে।

> বলা হয়েছে, সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ঐতিহাসিক

> বিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পায় দুটি পরস্পরবিরোধী চেতনার বৈপরীত্যে। যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু/ভূমিদাস কৃষকের সম্পর্কটির রাজনৈতিক চরিত্র নিহিত রয়েছে উচ্চবর্গীয় সামন্ত চেতনা ও নিম্নবর্গীয় কৃষকচেতনার বৈপরীত্যে। এই সম্পর্কের বিন্যাসগত রূপটি স্বভাবতই প্রকাশ পায় উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গতিতে এই প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্কটাই পুনরাবর্তিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও সম্পূর্ণ স্থিতিশীল, সমান্তরাল, সুবিন্যস্ত রূপ ধরে এগোয় না। তাতে দেখা দেয় রাজনৈতিক বিরোধ, বিদ্রোহ, বিদ্রোহদমন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের নানা অসম অভিব্যক্তি। (পার্থ, ১৯৯৮ : ৬-৭)

ঊর্ধ্বতন/অধস্তন উভয়ের চেতনা বিপরীতমুখী হওয়ায় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে স্থিতিশীল থাকে না। তাই একই প্রবাহ ধরে কালক্রমে এগিয়ে যাওয়ার ধারণার চেয়ে ঊর্ধ্বতন/অধস্তনের চেতনার দ্বান্দ্বিক প্রকাশ ঘটা বরং স্বাভাবিক।

> ফলে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। যেহেতু প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী, এবং যেহেতু এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণীই সক্রিয়, কেবল উচ্চবর্গই সক্রিয় আর নিম্নবর্গ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এমন নয়, সুতরাং ধরে নিতে হয় উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনওভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়। তা যদি না হত, তাহলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কোনও রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটা সম্ভব হত না। বস্তুত তাহলে কোনও দ্বন্দ্বই থাকত না, নিম্নবর্গের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চেতনার সার্বিকতায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতো। (পার্থ, ১৯৯৮ : ৮)

চেতনার পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও উচ্চবর্গের প্রতি নিম্নবর্গের অধীনতার মাঝেও যে দ্বান্দ্বিক রূপের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। রণজিৎ গুহ, গ্রামশির মূল দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। গ্রামশির মতে, "Subaltern groups are always subject to the activity of ruling groups, even when they rebel and rise up : only a 'parmanent' victory breaks their subordination, and that not immediately." (Lawrence & Wishart, 1971 : 54), অর্থাৎ নিম্নবর্গ, যারা সবসময় অখ্যাত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ক্ষমতার দিক থেকে বরাবর পিছিয়ে থাকে তারা অনবরত শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, এমনকি বিদ্রোহের কালে কিংবা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখানোর কালেও শাসকগণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না, কেবল 'স্থায়ী' বিজয়ের দ্বারাই এই অধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিম্নবর্গের ইতিহাস রচিত হয়েছে উচ্চবর্গের হাতে। সেখানে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা এসেছে নিতান্তই দায়সারা ভাবে। ফলে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং নিম্নবর্গের প্রতি উপেক্ষার ফলে ইতিহাসের প্রামাণ্য মুখ্যত উচ্চবর্গের সমৃদ্ধি ও বীরত্ব ও রাজনৈতিক

মুন্সিয়ানাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। "জনসমাবেশ যে কদাচিৎ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল তা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সত্যি যে সেই সমাবেশ অনেকবার এবং বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল জনসাধারণের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে।" (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ২৯) কেবল একজন নেতা বা নেতৃস্থানীয় কারও ডাকেই জনগণ সংঘবদ্ধ হয় নি। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্তরে নানা মাত্রায় নিম্নবর্গের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের প্রকাশ হয়েছে। এর জন্য সবসময় কাউকে উপর থেকে প্রেরণা দিতে হয় নি। নিজস্ব চৈতন্য দ্বারাই তারা নানাভাবে এটি করেছে।

এই নির্মাণে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকরাও সচেতনভাবেই ভূমিকা রেখেছেন। প্রথমত দেশীয় উচ্চবর্গ তথা সামন্ত ভূস্বামী, জমিদার প্রভৃতিদের দ্বারাই উপনিবেশের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। দেশীয় এই সামন্তবাদীদের স্বার্থরক্ষা করা মানে শাসকদের নিজেদেরই কার্য হাসিল ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দ্বিতীয়ত নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপকে স্বীকার করা মানে বিদ্রোহ, বিপ্লবকে উস্কে দেওয়া। বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার চেতনার পালে হাওয়া লাগা। সুতরাং তারা এটি করেনি। তৃতীয়ত বিদেশী শাসকদের জন্য এটি গ্লানিদায়ক বিষয়। তাইতো ন্যাশনাল থিয়েটারের *'নীল-দর্পণ'* নাটকে সাহেবের উপর এক নেটিভের আক্রমণের দৃশ্যের অভিনয় কে সহ্য করতে না পেরে সেই নেটিভ চরিত্রাভিনেতার উপরেই সত্যিকার হামলা চালিয়ে বসেন এক বিদেশী শাসক। রণজিৎ গুহের মতে, "সুতরাং ওই ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণ সব উড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল, উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ করে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেরই চিন্তা ও কাজ বলে।" (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ৩০) ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ইউরোপে যখন উচ্চবর্গ- নিম্নবর্গের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সাধারণ মানুষের জয়গান গীত হচ্ছে, সেসময় ঔপনিবেশিক অঞ্চলে সেই ইউরোপই উচ্চবর্গকে সমর্থন করে গেল। তাই নিম্নবর্গের চৈতন্য অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। দেখা উচিত "জনতার রাজনীতির অনুসন্ধান কালেও কীভাবে আমরা তাদের চেতনাকে স্পর্শ করতে পারি? কোন স্বর-চেতনায় দলিতরা কথা বলতে পারে?" (গায়ত্রী, ২০১১ : ৮৯)

২.১

'মুক্তধারা' প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ১৯২২ সালে লেখা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি ও মানবসভ্যতায় স্বাভাবিক গতিতে যান্ত্রিক আধিপত্যের কুফল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির দ্বারা এক বিশাল বাঁধ নির্মাণ করে মুক্তধারার ঝর্নাকে বেঁধেছেন। এর ফলে শিবতরাই অঞ্চলের মানুষদের

তৃষ্ণার জল ও ফসলের যোগান রুদ্ধ হয়। শিবতরাই অঞ্চলটি রাজা রণজিৎ-এর অধীন হওয়া সত্ত্বেও এধরনের কৌশল গ্রহণ করেছেন কেননা শিবতরাই তার নিকট স্রেফ একটি বিজিত জনপদ। রাজা রণজিৎ উত্তরকূটের নাগরিক। শিবতরাই থেকে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করা তার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে কিছুদিন ধরে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে শিবতরাইবাসী খাজনা প্রদান বন্ধ করে রেখেছে। দুর্ভিক্ষ থাকার কারণে কষ্টেসৃষ্টে নিজেদের খোরাকিটুকুর সংস্থান করা গেলেও খাজনা প্রদানের উদ্বৃত্ত ফসলের উৎপাদন করতে তারা ব্যর্থ হয়। রাজা রণজিৎ যুবরাজ অভিজিৎকে শিবতরাই অঞ্চলের শাসনভার দিয়েছিলেন জনগণকে নিয়ন্ত্রণের অভিপ্রায়ে। কিন্তু রাজার এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কেননা অভিজিৎ বরং অধিবাসীদের দুর্দশায় বিচলিত ছিল। শিবতরাই অঞ্চলের মানুষ যেনো উত্তরকূট অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল না হয়, সেজন্য বহুদিন ধরে অবরুদ্ধ নন্দীসংকটের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর ফলে শিবতরাইবাসীর বিভিন্ন অঞ্চলে পশম বিক্রি করে অর্থসংস্থান করার সুযোগ তৈরি হয়। অভিজিতের কর্মকা- শিবতরাইবাসীদের প্রীত করলেও উত্তরকূটে নিন্দিত হয়। রাজা তার শ্যালককে অভিজিতের স্থলাভিষিক্ত করেন। যুবরাজ অভিজিৎ রাজা রণজিতের ঔরসজাত নয়। রাজা তাকে ঝর্নাতলায় কুড়িয়ে পেলেও আপন সন্তানের মতই বড় করে উত্তরসূরি হিসেবে ভেবেছেন। অভিজিৎ একথা জানার পর স্বেচ্ছায় রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝর্নাতলায় এসে অবস্থান নেয়।

এদিকে ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে শিবতরাইবাসী খাজনা দিতে অস্বীকার করে। বিদ্রোহী প্রজাদের বশে আনার জন্যই রাজা রণজিৎ মুক্তধারার প্রবাহ বন্ধ করেন। ওদিকে উত্তরকূটের জনগণ অভিজিৎকে শিবতরাইয়ের পক্ষের লোক হিসেবে অভিযুক্ত করায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে অভিজিৎকেও বন্দী করা হয়। মোহনগড়ের রাজা এসে তাঁকে মুক্ত করে নিতে চাইলেও মোহনগড়ে যাবার প্রস্তাব বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে বরং অন্য পথে এগিয়ে যায় অভিজিৎ। বাঁধ ভেঙে প্রবাহ উন্মুক্ত করে দেয় আপন প্রাণের বিনিময়ে।

'*মুক্তধারা*'-নাটকে গতির স্তব্ধতায় জীবন ব্যাহত হওয়া এবং যন্ত্রের সাথে প্রাণের সংঘাতের চিত্র দেখা যায়। যন্ত্র মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করলে মনুষ্যত্ব নিপীড়িত হয়। তাছাড়া ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের বহিঃপ্রকাশ এখানে স্পষ্ট। আগ্রাসী শক্তির দ্বারা দুর্বলকে দমিয়ে অধীনতাকে চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায় নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। '*মুক্তধারা*'-নাটক সম্বন্ধে ১৩২৯ সালে শ্রীকালিদাস নাগকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন

> আমি মুক্তধারা বলে একটি ছোট নাটক লিখেছি। এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তাঁর ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছো সেই machine নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে। অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। (কনক, ১৩৭২ : ১৩৫)

২.২

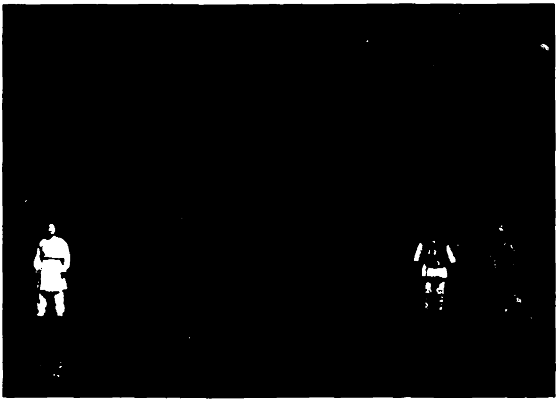

চিত্র ১: পেছনে বাঁধ, ডানদিকে যুবরাজ অভিজিৎ, বামদিকে বিভূতি ও মাঝে অম্বা।

১ নম্বর চিত্রে একটি প্রতীকার্থ বিনির্মিত হয়েছে। একপাশে বিভূতির অবস্থান। বিভূতি বাঁধের স্রষ্টা। বিপরীত প্রান্তে অভিজিৎ, বাঁধ ভেঙে নদীকে মুক্তকারী। মাঝে অম্বা, বাঁধের জন্য যিনি সন্তানহারা। সন্তানহারা অম্বা, তার ছেলে সুমনের খোঁজ করে। সুমন বাঁধ তৈরিতে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি। সুমন চলে গেছে না ফেরার দেশে। অম্বা তা মানতে নারাজ। ছেলের অন্বেষণে সে প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়ায়। মূলত যন্ত্রসভ্যতার জাঁতাকলে মানুষের প্রাণ কিভাবে তুচ্ছ হয় তারই বহিঃপ্রকাশ এখানে দেখা যায়। বাঁধের সামনে অসহায় অম্বা ছেলের খোঁজে দিশেহারা। পাশেই যন্ত্ররাজ বিভূতি বাঁধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। উভয়ের কর্মকাণ্ডের পেছনের উৎস বাঁধ। বাঁধই ছেলে সুমনকে অম্বার কাছ থেকে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে সেই একই বাঁধ বিভূতির কাছে গর্ব, মহৎ সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত। অম্বার অসহায়ত্ব উত্তরকূটের ঔপনিবেশিক স্বার্থের নিকট নিতান্তই তুচ্ছ। অম্বার ছেলে নিখোঁজ হওয়াতে কারও কিছু যায় আসে না। ছেলে হারানোর যাতনা, তাকে একাই বয়ে বেড়াতে হয়।

নাটকে শিবতরাইবাসীদের অসহায়, ভীতু রূপে দেখা যায়। তাদের কৃষি, ব্যবসা তথা জীবন ধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্তরকূটের উপর নির্ভরশীল। কৃষির জন্য পানি আবশ্যকীয় উপাদান। এই পানির উৎস উত্তরকূটের অধীন। পিপাসা ও অন্যান্য কাজেও পানিহীন অবস্থায় দিনযাপন করা অসম্ভব। আবার দেখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও শিবতরাইবাসী অসহায়। নন্দীসংকটের পথ রুদ্ধ থাকায় তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বাইরে গিয়ে বিক্রি করতে পারছে না। এই পথ বন্ধ রেখেছে উত্তরকূট। শিবতরাইবাসী যেন এই পথে বের হয়ে ভিন্ন অঞ্চলে যেতে না পারে এবং উত্তরকূটের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়। শিবতরাই উত্তরকূটের নিকট বিজিত জনপদ ও উপনিবেশ এবং ফসল, খাদ্য, পিপাসা, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ও উত্তরকূটের উপর নির্ভরশীল;

এই নির্ভরশীলতা একদিকে আধিপত্যবাদের নিরিখে উত্তরকূটবাসীকে উচ্চবর্গ, অন্যদিকে অধীনতার নিরিখে শিবতরাইবাসীকে নিম্নবর্গে স্থিত করছে। যেহেতু শিবতরাই উত্তরকূটের নিকট বিজিত জনপদ ও উপনিবেশ এবং ফসল, খাদ্য, পিপাসা, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার ও উত্তরকূটের নিকট নির্ভরশীল; তাই উত্তরকূটবাসীর নিকট শিবতরাইবাসী নিম্নবর্গ।

শিবতরাই ও উত্তরকূট উভয় অঞ্চলকে নাট্যক্রিয়ায় শারীরিক চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যায়-

চিত্র ২: উত্তরকূটবাসী

২ নম্বর চিত্রে উত্তরকূটবাসীদের ঐক্যবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্থির ও দৃঢ় পদযুগলের ব্যবহারের ফলে শক্তিশালী রূপে দেখাচ্ছে। উত্তরকূট ঔপনিবেশিক শক্তি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাছাড়া নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসী।

চিত্র ৩ : শিবতরাইবাসী

চিত্রে শিবতরাইবাসীদের অবিন্যস্ত, বিচ্ছিন্ন, অনিয়ন্ত্রিত ও অগোছালো দেখাচ্ছে। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি যেন তারা উদাসীন এবং আত্মবিশ্বাসহীন।

দীর্ঘদিন নন্দীসংকটের পথ রুদ্ধ থাকলেও শিবতরাইবাসী কোন উদ্যোগ নেয়নি। এই পথ মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন যুবরাজ অভিজিৎ। তাছাড়া ধনঞ্জয় বৈরাগী নেতৃত্ব প্রদানের পরই তারা খাজনা প্রদানে বিরত থেকেছে, তার আগে নয়। রাজার সামনে তারা আসতেও চায় না কিংবা বুঝতেও চায় না, কেবল ধনঞ্জয়কেই বুঝতে চায়। ফলে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটে না। কোনটি তাদের জন্য মঙ্গলদায়ক হবে, সেটাও তারা বুঝতে পারে না। তাছাড়া শিবতরাইবাসী নিজেরা সংকট সমাধানে অপারগ। সংকটসমাধানের জন্য, তাদের পক্ষে এগিয়ে আসতে হয় অভিজিৎকে। তারা কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ। সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তাদের একজন সিদ্ধান্তকারীর প্রয়োজন হয়। বৈরাগী ধনঞ্জয় সেই দায়িত্ব পালন করেন।

চিত্র ৪ : শিবতরাইবাসীর সাথে ধনঞ্জয় বৈরাগী।

৪ নম্বর চিত্রে শিবতরাইবাসী বসে আছে এবং তাদের মাঝে হাস্যোজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাসী, সমুন্নত ধনঞ্জয় বৈরাগীকে দেখা যাচ্ছে। দুজন অভিনেতৃ হাতজোড় করে আছে এবং অন্যরা আস্থা, আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধনঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ধনঞ্জয় অভিনেতা মুখ্যত বাচিককে গুরুত্ব দিয়ে অভিনয় করেছেন।

চিত্র ৫ : রণজিৎ ও ধনঞ্জয়ের কথোপকথন ।

রাজা রণজিতের সাথে মুখোমুখি হয়ে শিবতরাই কথা বলতে পারে না । তারা রাজাকে ভয় পায় । ধনঞ্জয় রাজাকে ভয় পায় না । তাদের হয়ে ধনঞ্জয় কথা বলে । শিবতরাইবাসী ভীতু হওয়ার ফলে রাজা রণজিৎ তথা উত্তরকূটের পক্ষে সহজেই শিবতরাইবাসীকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে । উত্তরকূটের অধিবাসীদের সাথে দেখা হলে শিবতরাইবাসীর ভীতরূপের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ।

চিত্র ৬ : উত্তরকূট ও শিবতরাইবাসী ।

উপরের চিত্রে সাদা পোশাক পরিহিতগণ উত্তরকূটের নাগরিক । উত্তরকূটের মানুষের শরীরী ভাষা, দেহের ভঙ্গী, দৃষ্টি ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিবতরাইবাসীর প্রতি

আধিপত্যকামী। এক হাত কোমরে রেখে সামনের দিকে সম্প্রসারিত পায়ের উপর অন্য হাত রাখার ফলে তাদের শক্তিশালী দেখাচ্ছে। ইউজেনিও বারবা বর্ণিত প্রাত্যহিক অতিরিক্ত দক্ষতার ব্যবহার, যেখানে ন্যূনতম বাহ্য ফলাফলের জন্য সর্বোচ্চ কর্মশক্তির অঙ্গীকারের নীতি অনুসরণ করে। সেই প্রাত্যহিক অতিরিক্ত দক্ষতার ব্যবহারের ফলে উত্তরকূট চরিত্রাভিনেতাদের শক্তিশালী করেছে এবং অধিকাংশ অভিনেতার দেহের ভঙ্গী সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ হয়েছে। বিপরীতে শিবতরাইবাসীকে নিতান্তই গোবেচারা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে : উত্তরকূট অধিবাসীরা শিবতরাইদের প্রহার করে সমূলে ধ্বংস করবে। উত্তরকূটবাসীর কাছে তাদের ভীত, দুর্বল ও হীন মনে হচ্ছে। উত্তরকূটের মানুষদের সামনে মুখোমুখি কথা বলার হিম্মৎ কিংবা অধিকারটুকুও যেন তাদের নেই। বাঁধনির্মাণ, নন্দীসংকটের পথ রুদ্ধ করার দ্বারা খাদ্য, পিপাসা, উপার্জনের সম্ভাবনা সংকুচিত করার মাধ্যমে উপনিবেশ উত্তরকূট শিবতরাইয়ের মৌলিক অধিকার ও আত্মসম্মানবোধটুকুও যেন হরণ করেছে।

প্রযোজনায় ব্যবহৃত পোশাক উল্লেখযোগ্য কিছু তাৎপর্য নির্দেশ করছে। উত্তরকূটের পোশাক 'নাগরিক' বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মুক্তধারা নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিতে উত্তরকূটবাসীর প্রতি শিবতরাইয়ের মানুষের সংলাপ থেকে জানা যায় "আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরণটা?" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৯ : ২১১)। প্রযোজনায় পোশাক পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। শুভ্র, সুগঠিত পোশাকের সাথে উত্তরকূটবাসীর পরিহিত জুতো এবং পায়ের জিগজ্যাগ লাইনের বিপরীতে নাটকে শিবতরাইবাসীর পা দেখা যায় জুতোহীন। শিবতরাইদের পোশাকের নিচের দিক প্রায় হাঁটুর নিকট ওঠানো। ফুল-পাতাবেষ্টিত, মুকুট, ঘরে তৈরি জামা, মুখের অঙ্কন ইত্যাদি শিবতরাইবাসীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে বসবাসকারী আঞ্চলিক নৃ-গোষ্ঠীর কথাই স্মরণ করায়, বহির্বিশ্বের সাথে যাদের যোগাযোগ সীমিত কিংবা নেই এবং 'সভ্য' উত্তরকূটের নিকট তারা পশ্চাৎপদ। সচেতনভাবে এই বৈপরীত্য আনা হয়েছে। উত্তরকূট অধিবাসিগণকে অধিকতর সভ্য অন্যদিকে শিবতরাই অধিবাসীদের অধিকতর প্রকৃতির নিকটবর্তী এবং আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরবর্তী হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে। পোশাক ও মেকআপের নান্দনিক প্রয়োগ সত্ত্বেও এহেন শারীরিক ভাষা ও পরিকল্পনার ফলে শিবতরাইবাসীকে আরও কম জানা, বোকা, অধস্তন হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

উত্তরকূটে কি নিম্নবর্গ নেই? বয়স, পেশা, শ্রেণী, লিঙ্গ ইত্যাদি কোনভাবে নিম্নস্থিত কেউ কি নেই? উত্তরকূটের সাধারণ অধিবাসী সবাইকে একইরকম পোশাক, আচরণ, স্যালুট করার রীতি এবং শিবতরাইগণকেও একই পোশাক, আচরণ দ্বারা প্রযোজনার পরিকল্পনায় সাধারণীকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে নাটকে উত্তরকূট অঞ্চলে উচ্চবর্গের

বসবাসের প্রতীকায়ন দ্বারা নির্দেশকের সাধারণীকরণ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। যদিও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এটি একটি শক্তিশালী নাটক।

> ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এমন তীব্র ধিক্কার ও ঘৃণা, সেই সঙ্গে যন্ত্রের রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা, রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন লেখায় এতো সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়নি ব্যক্তির প্রতিবাদ হিসেবে। (বার্ণিক, ১৯৮৭ : ১৩৭)

কিন্তু ঔপনিবেশিক উত্তরকূটের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা কাঠামো নাটকে উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে নাট্যকাঠামোতেও একরৈখিকতা দেখা যাচ্ছে। আধিপত্য বা বর্গের সম্পর্ক নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে ভৌগোলিক বা অঞ্চলগত ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ধারায় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের ক্ষমতা-সম্পর্ক প্রকাশ্য রূপ লাভ করে।

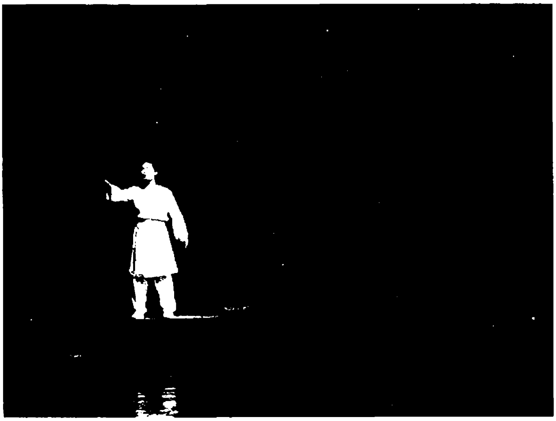

চিত্র ৭ : অভিজিৎ

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিতের জন্ম পথের ধারে, আবার মৃত্যুও পথেই। দীর্ঘদিন রাজপরিবারে বড় হবার পর ঝর্নাতলায় জন্মের কথা জেনে অভিজিৎ রাজগৃহ ত্যাগ করে ফের ঝর্নাতলায় এসে আশ্রয় নেয়। শিবতরাইবাসীর পণ্য ভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর জন্য উত্তরকূটের শাসককর্তৃক অবরুদ্ধ নন্দিসংকটের পথ উচ্চবর্গের পরিবারে বড় হওয়া এই অভিজিৎকেই কাটতে হয়। শিবতরাইবাসী কেউ এই কাজ করতে সাহস করে না। আবার শিবতরাইবাসীর পিপাসা ও ফসলের জলের প্রবাহ উন্মুক্ত করার জন্যও এগিয়ে আসেন অভিজিৎ। যে যন্ত্র অজস্র প্রাণকে সংকটে ফেলেছে, প্রাণের বিনিময়েই অভিজিৎ তা উন্মুক্ত করেন। অথচ এই বাঁধ পিতা রণজিতের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে। সৌন্দর্য ও মুক্তির প্রতি অভিজিৎ সচেতন। আধিপত্যবাদ ও মানবসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান। অভিজিৎ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে। শিবতরাই ও উত্তরকূট উভয় অঞ্চলই তার কাছে সমান। ফলে উত্তরকূট কর্তৃক বাঁধ নির্মাণে তিনি ভীষণ মর্মাহত।

তাই পিতা রাজা রণজিতের নির্দেশে তৈরি বাঁধের যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সে নিজেই প্রাণ বিসর্জন দেয়। ৭ নম্বর চিত্রে দেখা যায়, রাজপরিবারে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও অভিজিৎ সাধারণ পোশাক পরিহিত। যুবরাজ হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়ানো ও শারীরিক অভিব্যক্তিতে অহংকার নেই। সমুন্নত চলন ও স্বরের সংযত ব্যবহার দ্বারা অভিজিৎ চরিত্র নির্মিত হয়েছে।

দীর্ঘকালের ক্রমাগত শোষণ, লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের ফলে নিম্নবর্গ শিবতরাইবাসী স্বাভাবিক প্রকাশক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই নিম্নবর্গ শিবতরাইবাসীর সাহায্যের জন্য, চৈতন্য জাগ্রত করার জন্য বাইরে থেকে অনুঘটকের প্রয়োজন হচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক অবস্থান ও দর্শনগত ভিন্নতা সত্ত্বেও শিবতরাইবাসীর প্রতি অভিজিৎ ও ধনঞ্জয়–উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উভয়কেই শিবতরাইবাসী ভালবাসে। তবে উভয়ের কার্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ধনঞ্জয় এক্ষেত্রে অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে অভিজিৎ সংকটসমাধানে নিজেই সরাসরি অংশগ্রহণ করে। অভিজিৎ ও ধনঞ্জয়ের শারীরিক ও বাচনিক অভিনয় এবং পোশাক-দ্রব্য দ্বারা প্রযোজনায় তা প্রতিরূপায়িত হয়েছে।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর পোশাক শিবতরাইদের মতো নয়। তাঁর পোশাক ভিন্ন এবং দ্রব্যসম্বলিত (লাঠি)। শিবতরাইবাসীর থেকে ধনঞ্জয় আলাদা। ধনঞ্জয় বৈরাগী শিবতরাইয়ের অন্য অধিবাসীদের চাইতে ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। তার নামের সাথে বৈরাগী বিশেষণটি আছে। বৈরাগী অর্থাৎ সংসারে যার অনাসক্তি আছে কিংবা বিষয়ভোগে যিনি উদাসীন। নামে বৈরাগী অথচ নাটকে নিম্নবর্গের জাগতিক অধিকার আদায়ে ধনঞ্জয়ই সামনে থেকে এগিয়ে এলেন। তিনি ঢেউকে বাড়ি মেরে নয়, প্রবল ঢেউয়ের মাঝে হাল স্থির রেখে ঢেউ জয় করার পক্ষে।

শিবতরাইদের পক্ষে কথা বললেও তিনি শিবতরাইদের একজন নন। প্রকৃতপক্ষে প্রতীকী এই চরিত্র শিবতরাইবাসীদের মধ্য থেকে নয় বরং বাইরে থেকে এসে চৈতন্য জাগ্রত করছেন। তিনি শিবতরাইবাসীদের মতো নিম্নবর্গীয় নন। শিবতরাইয়ের মানুষ বৈরাগীর ভারী দর্শন শুনতে চায় না বা বুঝতে পারে না। তারা বৈরাগীকে বুঝেছে, এটাই যথেষ্ট মনে করে। বৈরাগী যা করতে বলবে, তারা তাই করবে। শিবতরাই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে গণেশ নামে এক সর্দারকে দেখা যায়। গণেশ ছাড়াও আরও মানুষের ক্রিয়া নাটকে দেখা যায়। কিন্তু তাদের কোন ব্যক্তিক পরিচয় পাওয়া যায় না এবং কেউ বিশিষ্ট হয়েও ওঠেনি। তারা তাদের ব্যক্তিক পরিচয়কে প্রকাশ করে না। তাদের সামষ্টিক উপস্থিতিই লক্ষণীয়। সর্দার হলেও গণেশও ধনঞ্জয়কেই দেবতা জ্ঞান করে। শিবতরাইয়ের অন্য অধিবাসীদের ন্যায় সেও রাজার সম্মুখীন হতে চায় না, বাঁধের ভয়াবহতা আঁচ করতে ব্যর্থ হয় এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথাই শেষ কথা বলে মানে। শিবতরাইয়ের সব মানুষকে প্রায় একই চিন্তার অধিকারী হিসেবে দেখানোর ফলে তাদের ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্য নাকচ হয়ে

যায়। ব্যক্তি যখন সামষ্টিক পরিচয় ছাপিয়ে কথা বলে উঠতে পারে না তখন সামষ্টিক পরিচয়ই কি একমাত্র পরিচয় হয়ে যায় না?

৬ নম্বর চিত্রে আমরা দেখি উত্তরকূটের ভয়ে শিবতরাই কোণঠাসা। সামষ্টিকভাবে তারা আত্মসমর্পণ করেছে। ব্যক্তিক পরিচয়ের কোনো আভাস নেই। অথচ সামষ্টিকভাবে প্রতিরূপায়ণের পরও নির্দিষ্ট, ক্ষুদ্র ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারত। যেহেতু স্বতন্ত্র চিন্তা, পৃথক বৈশিষ্ট্য মানুষের সহজাত প্রকৃতি। প্রতিরূপায়ণে সাধারণীকরণের ফলে সেটা দেখা যায় নি। তাই বলা যায়, প্রতিরূপায়ণে নিম্নবর্গের চৈতন্যের নিজস্ব গড়ন অনুপস্থিত ছিল। বস্তুত 'মুক্তধারা'-নাটকে ধনঞ্জয় হল প্রতীকী চরিত্র। শাহিদ আমিন বলেন "কিন্তু কৃষকের এই মহাত্মা প্রকৃত গান্ধী নয়, কৃষকের কল্পনার প্রতিরূপ তিনি।" (শাহিদ, ১৯৯৮ : ৬৫)

২.৩

শিবতরাই অঞ্চলের অধীনতা, অজ্ঞতা থেকে মুক্তির প্রতীক হিসেবে নাট্যকাঠামোতে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ। শিবতরাইয়ের নিম্নবর্গের বঞ্চনা, শোষণের প্রতিবাদরূপে উঠে আসে ব্যক্তিচরিত্র ধনঞ্জয়। শ্রীকালিদাস নাগকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে; কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছায় না- আমি মার না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না মার দিয়ে ঠেকাব। (কনক, ১৩৭২ : ১৩৬)

যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকারভাবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি ও মানবসভ্যতায় স্বাভাবিক গতিতে যান্ত্রিক আধিপত্য উপস্থাপিত করেছেন এবং সেই আধিপত্য ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও নাটকে উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু প্রতিবাদের জন্য শিবতরাইবাসিগণ নিজেরা এগিয়ে আসেনি বরং তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাদের চেয়ে স্পষ্টই স্বতন্ত্র, প্রাজ্ঞ ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আসতে হয়েছে এবং আত্মাহুতি দিয়ে জলপ্রবাহ উন্মুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে রাজপরিবারে বেড়ে ওঠা একজন উচ্চবর্গ, রাজা রণজিতের পুত্র অভিজিৎকে। শিবতরাইবাসী কোন সাধারণ নাগরিকের এই প্রকার অনুভূতি কাজ করেনি। অন্যদিকে একরৈখিকভাবে শিবতরাইবাসীর শুধু ধনঞ্জয়ের অনুগামী হওয়ার ফলে নিম্নবর্গের স্বাধীন, ব্যক্তিক, বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের গড়ন সীমাবদ্ধ থাকে। কেবল এক নেতার কথাতেই জনগণ অনুপ্রাণিত হয়েছে, তার বাইরে জনগণের কোন বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ দেখা যায় নি। ফলে নিম্নবর্গের চৈতন্যের নানা স্তর, বাস্তবতা ও জটিল রূপকে অস্বীকার করা হয়েছে। সাধারণীকরণ দ্বারা

শিবতরাই অঞ্চলের সব অধিবাসীকে একই অক্রিয় সামষ্টিক ছাঁচে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে থিয়েটার (বেইলি রোড)-এর প্রতিরূপায়ণে পোশাক, বিন্যাস, অভিনয়, মেকআপ ও সর্বোপরি পরিকল্পনায় ধনঞ্জয় বৈরাগীকে 'মারখানেওয়ালার ভিতরকার' মানুষ মনে হয়নি এবং নিম্নবর্গ শিবতরাইবাসী অধিকতর বিশেষিত ও অক্রিয় থেকেছে।

নাটকে নিম্নবর্গ শিবতরাইবাসী সাধারণ মানুষদের ভীতু, বোকা, নিজেদের ভালো-মন্দ বিচারে অক্ষম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণও সার্থকতার সাথে অভিনয়শৈলী প্রদর্শন করেন। ফলে "নিম্নবর্গের চৈতন্যের অসমতা, স্তরভেদ, উপাদান-ও-অবস্থাভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ" (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ৪০) নাটকে দেখা যায় না।

শিবতরাইবাসীর আপাত সামষ্টিক অক্রিয়তার ভেতর ব্যক্তি ধনঞ্জয় যখন কথা বলেন তখন তিনি পরোক্ষভাবে সমগ্র শিবতরাইয়েরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলে পরোক্ষ সক্রিয়তা ঘটছে।

> এমন কী যারা জাতীয়তাবাদে ও জাতীয় আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা সত্যই বুঝতে ও বর্ণনা করতে চান, সেই সব লেখক ও গবেষকও অনন্যোপায় হয়ে উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিকেই শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সমাজের নীচের তলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমাবেশগুলিকেও দলাদলি বা খাড়াখাড়ি জমায়েতের গতানুগতিক ছকে সাজাবার চেষ্টা করছেন। (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ৩১)

প্রতিরূপায়ণে অধিকাংশ শিবতরাইবাসীর অক্রিয়তার ফলে সামষ্টিকভাবে তারা ধনঞ্জয়ের ভাবনারই অনুগামী হয়েছে। অর্থাৎ ঋদ্ধ নেতা ধনঞ্জয়ের ডাকেই তাদের চিন্তা পরিচালিত হচ্ছে।

> জনসমাবেশ যে কদাচিৎ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল তা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সত্যি যে সেই সমাবেশ অনেকবার এবং বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল জনসাধারণের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে। (রণজিৎ, ১৯৯৮ : ২৯)

থিয়েটার (বেইলি রোড)-প্রযোজিত ও নায়লা আজাদ নূপুরনির্দেশিত *'মুক্তধারা'*-নাটকের নির্দেশক সার্থকতার সাথে নাটকে ওরিয়েন্টাল আর্ট যুক্ত করেছেন। অ্যামাজান ইন্ডিয়ান বারাকার মেকআপ ব্যবহার করেছেন যা নাটকটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাছাড়া উত্তরকূট অধিবাসীদের কোরাস দৃশ্যে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় পদযুগলের ব্যবহার, নাটকজুড়ে পরিমিত ছন্দের ব্যবহার উল্লেখ করার মতো। নিম্নবর্গীয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রতিরূপায়ণে দেখা যাচ্ছে উচ্চবর্গ উত্তরকূটের বিপরীতে নিম্নবর্গ শিবতরাইবাসী আপাত অক্রিয়তার ভেতরেও চেতনার বহিঃপ্রকাশ করছে যদিও তা পরোক্ষ, কেননা তাদের এই চেতনার প্রতীকী কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখা যায় ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। অন্যদিকে শিবতরাইবাসীর সংকটের সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হয়

অভিজিৎকে। ফলে সম্ভাবনা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের চৈতন্যের শক্তিশালী ও প্রত্যক্ষ গড়ন প্রকাশিত হয়নি। ধনঞ্জয় বৈরাগী দ্বারা খাড়াখাড়ি গতানুগতিক জমায়েতে পরিণত হয়েছে এবং অভিজিৎ ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ধনঞ্জয়কে যদি শিবতরাইয়ের নেতা হিসেবে দেখা হয় এবং অভিজিৎকে ত্রাতা হিসেবে দেখা হয়, তাহলে একজন নেতার কথা দ্বারাই সবাই প্রভাবিত হয়েছে এবং ত্রাতার দ্বারা মুক্তি পেয়েছে। অথচ এর বাইরেও নিজস্ব চৈতন্য জাগ্রত হতে পারত। প্রতিরূপায়ণের অভিনয়ে সামষ্টিক পরিচয় দ্বারা নিম্নবর্গের সরলীকরণ সম্পাদন করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭২), *রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক*, এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (২০১১), দলিতরা কথা বলতে পারে? *উপনিবেশবাদ ও উত্তর ঔপনিবেশিক পাঠ* (ফকরুল চৌধুরী সম্পা.)। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা (অনু. আলী আজগর)।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮), নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ইতিহাস, *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বার্ণিক রায় (১৯৮৭), *রবীন্দ্রনাথের নাটকের উৎস*, সিগ্‌মা, কলকাতা।

রণজিৎ গুহ (১৯৯৮), নিম্নবর্গের ইতিহাস, *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৪৯), মুক্তধারা, *রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

শাহিদ আমিন (১৯৯৮), গান্ধী যখন মহাত্মা, *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

Lawrence & Wishart. (1971), SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS Of ANTONIO GRAMSCI (Hoare and Smith trans.), International Publishers co., London.